সকাল বেলার আলো: মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত

— সেক আপতার হোসেন

শঙ্খ ঘোষ রচিত 'সকাল বেলার আলো'(১৯৭২) শিশু মনের অন্যতম বিকাশ ক্ষেত্র। এ রচনায় লেখক নীলু চরিত্রের মনভূমি নির্মাণ করার লক্ষ্যেই আখ্যানের আয়োজন করেছেন। শিশু চরিত্র নির্মাণের অন্যতম দাবিদার বিভূতিভূষন -এর দ্বারা তিনি প্রভাবিত হতে পারেন। কারণ অপুর মত নীলুর মধ্যেও ছিল জীবন জিজ্ঞাসা, পথের অনুরণন। অপু তার বাবার সঙ্গে পথে বেরিয়ে যেমন ছিল কৌতুহলী, তেমনি নীলুও তার মামার সংগে পথে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকে এটা কী, ওটা কী? তবে অপু চরিত্র যেখানে সাহসী এবং ফড়ওয়ার্ড সেখানে নীলু চরিত্র অনেকটাই অন্তর্মুখী। নীলু অন্তর্মুখী এ কারণেই যে লেখকের লক্ষ্য নায়ক নির্মাণ নয় অভিজ্ঞতার ডালিতে শিশু মনকে আধুনিক বাস্তবতারবোধে উত্তীর্ণ করা। যদিও এই বাস্তবতাবোধই তাকে 'সুপুরিবনের সারি'র মধ্য দিয়ে 'নগর পথের ধুলো' কিশোর উপন্যাসের নায়কত্বের ভিত নির্মান করেতে সাহায্য করেছিল। লেখকের সেই সফল পদচারণার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ 'সকাল বেলার আলো'।

চরিত্র নির্মাণে শঙ্খ ঘোষ বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছেন—

ক) পারিবারিক স্থিতি

খ) প্রকৃতি অন্বেষা

গ) জীবন অন্বেষা

নীলুর কাকা একজন দেশপ্রেমী মাঝে মাঝে বন্দেমাতরম বলে 'চেঁচাত'। এই অল্প পরিচয়ে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল চরিত্রের ভাব প্রবণ-সত্তা। সে দেশপ্রেমী অথচ দেশের জন্য সংগ্রাম কিংবা সংস্কারের কোন প্রসঙ্গ উল্লেখ নেই অথচ নীলু জানে তার কাকা একজন দেশপ্রেমী কারণ বন্দেমাতরম ডাক সে পরিচয়ই তুলে ধরে। ডারউইন -এর বিবর্তনবাদ হোক কিংবা প্যাভলভের আচরনবাদ সেই সঙ্গে ফ্রয়েডের জিন তত্ত্ব — এ কথাই স্বীকার করে যে নীলু চরিত্রের অন্তর্মুখীনতায় এবং উদারনৈতিক আচরণে তার পারিবারিক প্রভাব রয়েছে।

জীবন সম্পর্কে কৌতুহলী নীলুকে বারবার দেখতে পাই নীল আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছু অন্বেষণ করতে। একে আমরা প্রকৃতি অন্বেষণও বলতে পারি। চরিত্রের প্রকৃতি গড়ে তুলতে এই নীল আকাশ নীলু চরিত্রে প্রভাবশীল। সেও হয়তো নীল আকাশের মতোই উদার অসীমান্তিক, ধৈর্যশীল হয়ে উঠতে চায়। এই হয়ে ওঠার গল্প শোনায় 'সকাল বেলার আলো'।

লেখক শিশু চরিত্রের দোদুল্যমান মনের পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন। আমরা নীলু চরিত্রের মধ্যে দিয়ে এই বিষয়টির পরিচয় তুলে ধরতে পারি—

নীলু সাহসী হতে চায় কিন্তু সে সাহসী হতে পারেনা। বুল্টুদের আগে পদ্মার কাছে পৌঁছাতে হবে, তাই নীলু ভোর হওয়ার আগেই উঠে পড়ে। বাস্তবিক নীলুরা আগে পৌঁছাতে পারলেও বুল্টুকে বলতে পারেনা। কারণ নীলুর মনে ভয় যদি বুল্টু কিছু বলে দেয়।

নীলু বুদ্ধিমান হতে চায় কিন্তু বোকা থেকে যায়। কেশবকে শিক্ষক মহাশয় নীলুর খাতা দেখে লেখার জন্য বকা দেন। নীলু জানায় কেশব অনেক দূরে আছে, কেশব খুব ভালো ছেলে। কিংবা বরুণ-কেশবের কথোপকথনে যখন বরুন মনে করিয়ে দেয় কেশব অসুস্থ তখন নীলু মনে মনে ক্রুদ্ধ। কারণ তার বোধশক্তি মনে করিয়ে দেয় অন্ধকে অন্ধ বলতে নেই। অথচ প্রতিবাদ করার ভাষা পায়না নীলু। নীলুর এই সচেতন সত্তার পরিচয় পাওয়া যায় বৃষ্টিতে অসুস্থ কেশবকে না ভিজতে দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশে। অথচ দেখা যায় তাদের বৃষ্টিতে ভিজতে। এই বৃষ্টিই হয়ে ওঠে কেশবের মৃত্যুর কারণ।

নীলুর বড়োদের দেখে ভালো লাগে কিন্তু বড়ো হতে ইচ্ছে করে না। বড়ো হলে নিজের ইচ্ছাতে পড়া যায়, কেউ পড়তে বাধ্য করেনা। তবুও নীলুর বড়ো হতে ভালো লাগে না কারণ বড়ো হলে বাবাদের মতো বাজার যেতে হবে; বড়ো হলে বাসুদি যদি না থাকে পাশে। এভাবেই বিপরীত সত্তার দ্বন্দ্ব দোলায় দুলতে থাকে শঙ্খ ঘোষ নির্মিত নীলু চরিত্র।

আসলে নীলু একধরনের টাইপ চরিত্র। যার সাধ আছে অথচ সাধ্য নেই। শিশু চরিত্র হওয়ার জন্য নিজেকে সচেতন রাখতেও সে অক্ষম। তাই সে যখন নিজে এগিয়ে যেতে পারেনা, তখন অন্যদের পিছিয়ে যাওয়াটাই পছন্দ করে। যেমন দেখা যায় বুল্টু চরিত্র সাহসী ও অহংকারী, তাই নীলু তাকে কাঁদতে দেখতে চায়। নীলু চায় বুল্টু বালির মধ্যে ডুবে যাক। অন্যত্র নীলু সকাল বেলার ক্লাস পছন্দ করে কারণ শিক্ষকেরা উসখো খুসকো ভাবে ক্লাসে আসে। অন্য সময় তাঁরা ভালোভাবে সুসজ্জিত হয়ে আসেন, নীলু সে অবস্থায় জানা পড়াই ভুলে যায়। এর থেকে একটি বিষয় প্রমানিত হয় যে সে মনে মনে নায়ক হতে চায়, যদিও তার স্বভাব মেলে না। আসলে নীলু নিজেকে অর্জুন ভাবে। কিন্তু যখন সে কেশবকে বাঁচাতে পারে না তখন নিজের সম্পর্কে ভুল ভেঙে যায়। তা সত্ত্বেও নীলু চরিত্রের সদর্থক দিক এই যে সে কখনো নিজের কাছে হেরে যেতে শেখেনি। আমরা তার বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেয়ে থাকি—

ক) স্কুলের ঘন্টা সম্পর্কে নীলুর অভিব্যক্তি- 'থাকে। কিন্তু আমাদেরটার মতো? বল্? এটার একটা অন্যরকম শব্দ আছে না?'[১] এখানে নীলু বলতে চায় এই স্কুলের ঘন্টা সেরা ঘন্টা। এর প্রত্যুত্তরে বরুণ জানায়—'কটা ইস্কুলই বা তুই দেখেছিস?'

খ) শিক্ষক গগনবাবুর সংগে বেড়াতে বেরিয়ে নীলু জানায়—'আচ্ছা আপনার মনে হয়না স্যার আমাদের এই ব্রিজটাই সবচেয়ে সুন্দর সব ব্রিজের চেয়ে?'[২] এর উত্তরে গগনবাবু জানালেন—'আগে তাহলে বলো কটা ব্রিজ তুমি দেখেছ।'

—বরুণ কিংবা গগনবাবুর উত্তর নীলুর মনকে প্রশ্নচিহ্নে দাঁড় করিয়ে দেয়—'মনে পড়ে বরুণের কথা। বরুণও এইরকম বলেছিল একবার, কটা স্কুলই বা তুই দেখেছিস। সবাই ঠিক এক রকম করে কথা বলে কেন? আসল কথাটা কেউ কিছুতে বুঝতে পারেনা কেন?' এখানে নীলু নিজেকে অন্যদের থেকে বোদ্ধা মনে করে। অথচ সে দেখতে পায় তার মতটা ঠিক ঠিক মিলছে না। নীলু চরিত্রের মাহাত্ম এই যে সে অন্যকে দোষ না দিয়ে নিজেকেই অনুসন্ধান করতে থাকে। আমরা তার দৃষ্টান্ত পেয়ে যাই—

'নীলু ঠিক ধরতে পারেনা, সন্ধের সময়ে মেয়েদের এই গান তার ভালো লাগে, না কি ভালো লাগে না? গান তো ভালো। কিন্তু ওরা এই সময়ে গান গাইলে কেন মনে হয় বন্দিনী রাজকুমারীর গল্প?'[৩]

— নীলুর এ ভাবনা অহেতুক নয় কারণ লীলাদির বন্ধুদের সংগে ঘুরে বেড়ানো বন্ধ করতেই তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল গান সাধনা করতে। নীলুর কাছে বিষয়টি তাই 'বন্দিনী রাজকুমারীর গল্প'। নীলু ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতালব্ধ হয়ে উঠেছে। যে নীলু বরুণের বদলির খবর শুনে ভেবেছিল—জীবনের সব থেকে বড়ো দু:খ, সে তার থেকেও বড়ো দু:খ পেয়েছে কেশবের মৃত্যুতে। যে নীলু ভিখারিকে ভিক্ষা দিতে গিয়ে জেনেছে সি. আই. ডি. -কে, সে নীলু এখন ডিটেকটিভ গল্পের কল্পিত নায়ক। সে নীলু এখন দরজার ধাক্কায় হাতের যন্ত্রনাকে সহ্য করতে শিখেছে। লেখকের বর্ণনায়—

> 'দিদিমা জানেনা যে নীলু আসলে পড়ছিল একটা ডিটেকটিভ গল্প। সেটা শেষ করে শুতে যাবে বলে আলোটা নিবিয়ে ছিটকিনি দিতে গেছে দরজায়। তাড়াহুড়ো হয়েছে কী, দরজার পাল্লার মাঝখানে, সে এক কান্ড! শন্‌শন্ করে উঠল ওর সমস্ত রক্ত। চ্যাঁচাবে না কি? না:, দিদিমার তবে ঘুম ভেঙে যাবে, থাক। যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে হাতটা, মনে হচ্ছিল খানিকটা বুঝি মাংস উঠে গেল, তবু চুপ করে

গুটিগুটি শুয়ে রইল নীলু। তা যদি না-ই পারবে তাহলে মহাভারতের গল্প পড়ে কী আর লাভ হলো বলো।'[৪]

নীলু চরিত্র সমাজের কাছে নানা সময়ে বোকামির পরিচয় দিলেও তার আত্ম নির্মানের প্রচেষ্ঠা পাঠকের চোখে সহজেই ধরা পড়ে। তাই বরুণের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নীলুর ভাবনায় ধরা দেয়—

'সত্যিই তো গগনবাবু তো ডাকেননি ওকে। এমন তো হতে পারে যে গগনবাবু একলা তারই সঙ্গে কোনো কথা বলতে চান? না রাগ করাটা ঠিক হয়নি বরুনের। এটুকু তো বোঝা উচিৎ।'[৫]

নীলু এখানে যেন বড়োদের ক্ষুদ্র সংস্করণ। লেখক এভাবে নীলু চরিত্রকে সহ্য, ধৈর্য, অভিজ্ঞ আর সাহসী হওয়ার পথে চালনা করেছেন। তাই মহাভারত হোক কিংবা ডিটেকটিভ গল্প, পদ্মার তীর হোক কিংবা মুক্ত নীল আকাশ, কেশব-বরুনের সাহচর্য ও ত্যাগ, বুল্টুর শত্রুতা ও সহযোগিতা, কিংবা গগনবাবুর প্রাণবন্ত প্রকৃতিপ্রেম, গায়িকা লীলাদির বদ্ধতা কিংবা গায়ক ছোটোমামার মুক্তির ডাক — এ সবই নীলু চরিত্র নির্মাণের এক একটি সফল পদক্ষেপ। তাই অন্তরমুখী নীলু ডিটেকটিভ নীলু রূপে আজ বিশ্বের সন্ধানী।

তথ্যসূত্র:

১) শঙ্খ ঘোষ,'সকালবেলার আলো','ছোটোদের গদ্য শঙ্খ ঘোষ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৪২
২) শঙ্খ ঘোষ,'সকালবেলার আলো','ছোটোদের গদ্য শঙ্খ ঘোষ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৫১
৩) শঙ্খ ঘোষ,'সকালবেলার আলো','ছোটোদের গদ্য শঙ্খ ঘোষ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৫৬
৪) শঙ্খ ঘোষ,'সকালবেলার আলো','ছোটোদের গদ্য শঙ্খ ঘোষ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৪৬
৫) শঙ্খ ঘোষ,'সকালবেলার আলো','ছোটোদের গদ্য শঙ্খ ঘোষ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৫০

প্রকাশ: লালপরি নীলপরি, 2018